Prajñābāridhi : Journal of Multidisciplinary Research

Journal Homepage - https://www.collegetsm.in/college-journal/

বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আচার্য শঙ্করের অবদান

সুমিত কুমার নাথ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ

তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

Sumitsrilekha@gmail.com

8001308695

সারসংক্ষেপ : আচার্য শংকর সমগ্র ভারতবর্ষে যে বৈদিক ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন সেই কার্যের শুভারম্ভ হয়েছিল কাশিধামে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বারানসী হলো সনাতন বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। শংকর বিকৃত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবকে মুক্ত করে অখন্ড ভারতে সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রভাব ও প্রচারের ফলে বেদ ও বৈদিক ধর্ম বিশেষ করে বর্ণাশ্রম ধর্ম সংরক্ষিত হয়েছে। তাই আজও সনাতন হিন্দু ধর্ম শুধু বেঁচে নেই বরং সমগ্র বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করছে সগৌরবে। আচার্য শংকর ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আট বছর বয়সেই সব শাস্ত্র অধ্যায়ন করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করেন। এরপর তিন বছরের সাধনায় তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে পৃথিবীতে বহু দেবতারূপী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে , তারই মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আচার্য শংকর। তিনি ছিলেন হিন্দুদের গর্ব, সমগ্র হিন্দু সমাজ তাঁর কাছে ঋণী। আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আচার্য শংকরের অবদান।

সূচক শব্দ : বেদান্ত, ধর্ম, সনাতন, বৈদিক

ঐতিহাসিক যুগে যে সকল দেবমানব ধর্ম সংস্থাপনের জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য শংকর। আচার্য শংকর একজন প্রতিভাবান দার্শনিক মাত্র ছিলেন না। তিনি প্রধানত ছিলেন সত্য দ্রষ্টা ঋষি। অপরোক্ষানুভূতির জীবন্ত প্রেরণাই তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি মানব হয়েও অমানব, লোকবাসী অথচ লোকত্তর। যথা সময়ে তাঁর আবির্ভাব না হলে প্রবল বৌদ্ধ ধর্মের চাপে হিন্দু ধর্ম লুপ্ত হতো। এমনকি হিন্দুস্থান পুরোপুরি একটি ইসলামীয় স্থানে পরিণত হওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি হিন্দু ধর্মকে দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর অপূর্ব প্রতিভা,

অলৌকিক সাধন ও মনস্বিতার প্রভাবে পতন মুখ হিন্দু সমাজ রক্ষিত হয়েছে। সমগ্র হিন্দুধর্ম তার জীবনাদর্শে অভিনব রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। হিন্দু জাতি ওই বত্রিশ বছর বয়স্ক আচার্যের নিকট সর্বকালের জন্য ঋণী। আচার্য শংকর ভারতীয় ধর্মজীবনে এক নব দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিলেন এবং সমাজ জীবনে এনেছিলেন এক বৈপ্লবিক যুগান্তর।

আচার্য শংকর এর পিতা-মাতা বাল্য থেকেই শিব ভক্ত ছিলেন। অ-পুত্রক শিবগুরু ও বিশিষ্টা দুজনেই পরামর্শ করে ব্রত গ্রহণ করলেন এবং চন্দ্রমৌলিশ্বর শিবের স্মরণ নিলেন। কন্দমুল আহার, শিবের চরণামৃত পান, ব্রত, নিয়ম, পূজা-অর্চনা ও কৃচ্ছতা সাধন দ্বারা শরীর ক্ষয় করতে লাগলেন। ভগবান শিব তাদের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে কি প্রার্থনা জানতে চাইলে শিবগুরু তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বললেন- 'আমাকে একটি দীর্ঘায়ু সর্বজ্ঞ পুত্র দিন'। ভগবান শিব যেকোনো একটি কামনা করতে বললে শিবগুরু সর্বজ্ঞ পুত্রই কামনা করলেন। অবশেষে ৬৮৬ সালের ১২ই বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে কেরলের কালাডি গ্রামে শুভ মধ্যাহ্নে বিশিষ্টা দেবী শিশু পুত্র প্রসব করেন। মহাদেবের আশীর্বাদে প্রাপ্য পুত্র হওয়ায় পুত্রের নাম রাখলেন শংকর।

শিবগুরু দৈবজ্ঞদের দ্বারা নবজাতকের জন্ম কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়ে দেখলেন যে দেবস্বপ্ন সত্য হয়েছে, তাঁর পুত্র দেবাংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাতে আছে অবতার যোগ। বাল্য থেকে শংকর অতি শান্ত প্রকৃতির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁর প্রতিভা এবং অসামান্য মেধা জগতকে চমৎকৃত করেছিল। মাত্র তিন বৎসর বয়সে মাতৃভাষা মালায়ালামে বহু গ্রন্থ পড়ে ফেললেন। এমনকি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত শুনে শুনেই কণ্ঠস্থ করেন। এতটাই স্মৃতিধর ছিলেন যে যা শুনতেন বা পড়তেন সবকিছুই তাঁর স্মৃতিতে থেকে যেত। এই অলৌকিক মেধা দেখে পিতা শিবগুরু স্থির করলেন পঞ্চম বর্ষেই শংকরের উপনয়ন দেবেন এবং গুরুগৃহে পাঠাবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিবগুরুর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী মৃত পতির শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী শংকরের উপনয়ন দিয়ে তাকে গুরুগৃহে পাঠালেন।

অল্প দিনের মধ্যেই গুরু ওই বালকের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন। বালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, স্মৃতিশক্তি দেখে গুরুদেবের প্রিয় পাত্র হলেন শংকর। মাত্র দুই বছরের মধ্যেই শংকর ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা, চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন দর্শন অধ্যায়ন করে বৃহস্পতির ন্যায় সুপন্ডিত হন। একদিন ব্রহ্মচারী শংকর গুরুগৃহে নিয়মানুসারে ভিক্ষার্থে বেরিয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণী তার করুণ অবস্থার কথা শুনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে একটি আমলকি প্রদান করেন। বালক শংকর লক্ষ্মীদেবীর স্তব করে ব্রাহ্মণীকে দুঃখমোচনের আশ্বাস দেন। পরের দিনই সকালে ব্রাহ্মণী তাদের বাড়ির সর্বত্র স্বর্ণ আমলকি ছড়ানো দেখে বালক শংকরের আশীর্বাদেই যে তা হয়েছে তা চারিদিকে বলতে থাকেন। এভাবেই শংকরের অলৌকিক শক্তির কথা প্রচারিত হতে থাকে। শংকরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার জন্য তাকে বেশিদিন গুরুগৃহে বাস করতে হয়নি। যে সকল শাস্ত্র পাঠ অধিগত করতে মেধাবী শিষ্যদেরও বিশ বছর লেগে যায় গুরুর আশীর্বাদে শংকর মাত্র দুই বছর বয়সেই তা সমাপ্ত করলেন। ব্রহ্মচারী শংকর গৃহে বাস করে অধ্যাপনায় ও অধ্যায়নে মনোযোগী হলেন।

মাতৃ সেবা ছিল শংকরের সর্বপ্রধান কাজ ও শ্রেষ্ঠ সাধনা। দেবপ্রানা বিশিষ্টা প্রতিদিনই আলোয়াই নদীতে স্নান করতে যান এবং পথে কুলদেবতা কেশবের মন্দিরে পূজা-অর্চনা করে ফিরে আসেন। একদিন গ্রীষ্মকালে বিশিষ্টা স্নানে গিয়েছেন অনেক সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় শংকর উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি মায়ের সন্ধানে নদী পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন মা পথের মধ্যে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে আছেন। মায়ের সংজ্ঞা ফিরলে বাড়িতে আনার পর তিনি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন যে 'কৃপা করে নদীটি আমাদের বাড়ির কাছে এনে দাও, মায়ের কষ্ট দূর হোক'। মায়ের কষ্ট তাকে এতটাই অধীর করেছে যে তিনি একটি বারও ভাবলেন না নদীর গতিপথ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীভগবান বধির নন। ভক্তের প্রার্থনা তিনি

শোনেন, তাই সেই বর্ষাতেই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হল। উত্তর তীর ভেঙে আলোয়াই নদী প্রবাহিতা হল কালাডি গ্রামের পাশ দিয়ে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা অল্প দিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যদিও বর্তমান যুগে অনেকেই শংকরের প্রার্থনাতেই নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তবুও যা ভবিতব্য তাই শংকরের শুদ্ধচিত্তে প্রার্থনার মাধ্যমে স্পন্দিত হয়েছিল মাত্র।

শংকরের ঐশী শক্তির কথা শুনে কেরলের রাজা রাজশেখর স্বয়ং শংকর দর্শনে উপস্থিত হলেন কালাডি গ্রামে। শংকরের তীক্ষ্নবুদ্ধি, গভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বিচার শক্তি, রাজাকে চমৎকৃত করল। শংকর যে দৈবশক্তি সম্পন্ন সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। রাজা শংকরের চরণ প্রান্তে অনেক স্বর্ণমুদ্রা স্থাপন করে ওই দান গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। শংকর গম্ভীরভাবে বললেন, ‘মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, আমার এই স্বর্ণ মুদ্রার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া বিদ্যা দান ব্রাহ্মণের ধর্ম আর ধন দান রাজার কর্ম, আপনি এ ধন সৎপাত্রে বিতরণ করে দিন’। রাজা বুঝলেন শংকর শুধু সর্বশাস্ত্রবিশারদ পন্ডিত নন তিনি দৈবশক্তির আধার, অতি মানব। দুরস্থান হতে বহুলোক তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগল, তাঁর মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শোনবার জন্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাগত হতে লাগলেন।

একদিন কয়েকজন দৈবজ্ঞ বাহ্মণ শংকরের বাড়িতে এসে শাস্ত্র আলোচনার পর তাঁর জন্মপত্রিকা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তা দেখে বিচার করে তাঁরা দেখলেন শংকরের জন্মে অবতারযোগ আছে, তিনি পরিব্রাজক হবেন। ব্রাহ্মণদের মুখে এই কথা শুনে মা বিশিষ্টা বিমর্ষা হলেন। বেশ কিছুদিন পর শংকর সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। তিনি বুঝলেন সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান হয় না, জ্ঞানলাভ ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব তাই সুযোগ বুঝে মায়ের কাছে সন্ন্যাস নেওয়ার প্রস্তাব উপস্থাপন করতেই বিশিষ্টা শংকরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলে আমাকে কে দেখবে? আমি প্রাণ থাকতে তোমায় সন্ন্যাসী হতে দেব না’। এদিকে শংকরের প্রাণে তখন সন্ন্যাস গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তাই তিনি একান্ত মনে সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপার ওপরে নির্ভর করে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছা ঐশী ইচ্ছার কাছে পরাজিত হয়।

একদিন বিশিষ্টাদেবী ও শংকর একসঙ্গে আলোয়াই নদীতে স্নান করছিলেন। বিশিষ্টাদেবী স্নান করে উঠে পড়লেও শংকর তখনও স্নান করছিলেন, এমন সময় এক কুমির শংকরকে আক্রমণ করল এবং ক্রমেই গভীর জলে টেনে নিয়ে যেতে লাগল, বিশিষ্টাদেবী সহ বাকি যারা স্নান করছিল তারা চেষ্টা করেও শংকরকে তীরে তুলতে পারল না। এমন সময় শংকর তাঁর মাকে বললেন, ‘মা আপনি তো আমায় সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন না, সন্ন্যাস ভিন্ন মুক্তি নেই। আপনি যদি এখনও আমায় অনুমতি দেন তাহলে ভগবানকে স্মরণ করে অন্তিম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রাণ ত্যাগ করলে আমি মুক্তি পাব’। শংকরের এমনও পরিস্থিতি দেখে তাঁর মা তাকে সন্ন্যাসী হবার অনুমতি দিলেন। মায়ের অনুমতি পেয়ে শংকরের মন প্রাণ ভরে গেল এক অনির্বচনীয় আনন্দে। সেই দিন থেকে শংকর আর স্বগৃহে যাননি, কেননা শাস্ত্র অনুযায়ী সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বগৃহে বাস নিষিদ্ধ। বিশিষ্টাদেবী অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে আটকাতে পারেননি। উপরন্ত শংকর মাকে বলেন, ‘আপনার আশীর্বাদেই আমি যোগসিদ্ধ হব এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করব আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন আমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক ও সফল হোক’। সবই ভবিতব্য জেনে বিশিষ্টা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ‘তাই হোক বাবা আমি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি তুমি সিদ্ধ মনোরথ হও’, এই বলে নিজে হাতে শংকরকে সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়ে দেন। শংকর মাতৃ চরণে প্রণত হয়ে তার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে কুল দেবতা কেশব ভগবানের দর্শনে চললেন।

গুরু গৃহে ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠকালে যখন পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্য অধ্যায়ন করেন তখন বিদ্যাগুরুর মুখে শংকর শুনেছিলেন যে স্বয়ং পতঞ্জলি দেব সহস্র বৎসর যাবৎ সমাধিস্থ আছেন এক গুহার মধ্যে, যিনি গৌড়পাদের প্রধান শিষ্য গোবিন্দপাদ নামে পরিচিত। গোবিন্দপাদের কথা শুনে শংকর মনে মনে তাকে গুরুপদে বরণ করলেন এবং অদ্বৈত জ্ঞানলাভের সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরপর শংকর ক্রমে গ্রাম অতিক্রম করে নর্মদার অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন আট বছরের বালক সংসার সুখে বিতরাগ হয়ে মায়ের স্নেহাঞ্চল ত্যাগ করে চলেছেন তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে, অজানা অজ্ঞাতপথে। পদব্রজে সুদূর কেরল দেশ থেকে দু মাসেরও বেশি পথ চলে তিনি উপনীত হলেন নর্মদাতীরস্থ ওঁকারনাথে। গুহামধ্যে শত শত বছর ধরে ধ্যানমগ্ন গোবিন্দপাদকে দেখে শংকরের অন্তর এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে ভরে গেল। শংকর ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জন্য গোবিন্দপাদের চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করলে গোবিন্দপাদ শংকরের পরিচয় জেনে বুঝলেন ইনি শিবাবতার শংকর, যাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করার জন্য সহস্র বৎসর অবস্থান করে আছেন এই সমাধিতে। এক শুভ দিনে গোবিন্দপাদ শংকরকে যথাবিধি শিষ্য রূপে গ্রহণ করে যোগাদি শিক্ষা দিতে লাগলেন। মাত্র দু বছরের মধ্যে তিনি সমস্ত যোগ শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

বর্ষাকাল, কয়েক দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির ফলে নর্মদা নদীর জল বেড়ে ক্রমে বন্যার রূপ ধারণ করেছে। এদিকে গুরু গোবিন্দ গুহার মধ্যে কয়েকদিন ধরে সমাধিস্থ হয়ে আছেন। গুহার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত জল এসে যাওয়ায় সকলে চিন্তিত। এমন সময় শংকর একটি মৃৎ কুম্ভ সংগ্রহ করে গুহার দ্বারে স্থাপিত করে সন্ন্যাসীদের বললেন আপনাদের চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি গুরুদেবের-ও সমাধি ভঙ্গের কোন প্রয়োজন নেই। বন্যার জল এই কুম্ভে প্রবেশ করে প্রতিহত হবে। শংকরের এই কার্যকে সকলে ছেলেমানুষি মনে করলেও পরবর্তীতে শংকরের এই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলেই হতবাক হয়েছিল। গোবিন্দপাদ বুঝলেন তার কার্য শেষ হয়েছে, শংকরের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এক শুভদিনে গোবিন্দপাদ শংকরকে কাশিধামে যাওয়ার কথা বলে সমাধি যোগে দেহত্যাগ করলেন। গোবিন্দপাদের দেহত্যাগের পর শংকর গুরুর আদেশ মত বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে নিত্য গঙ্গা স্নান করে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শন করে ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকতে শুরু করলেন।

চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সৎগুরুর সন্ধানে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে কাশিতে এসে উপস্থিত হলেন। কিছুদিন কাশিতে থাকার পরই লোকোমুখে শংকরের অলৌকিক শক্তি ও অসামান্য প্রতিভার কথা শুনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শংকরের নিকট একদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রার্থনা জানালে শংকর প্রসন্ন হয়ে ওই ব্রাহ্মণ বালককে শিষ্য রূপে গ্রহণ করে দীক্ষিত করলেন সন্ন্যাস ধর্মে। এই বালক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীই হলেন শঙ্করের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য সনন্দন, যিনি পরবর্তীকালে পদ্মপাদ আচার্য নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

কথিত আছে, শংকর সশিষ্য চলেছেন গঙ্গা স্নানে। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ দেখলেন এক কদাকার চন্ডাল শৃঙ্খলাবদ্ধ চারটি কুকুর নিয়ে এগিয়ে আসছে বিপরীত দিক থেকে। আচার্য চন্ডাল কে কুকুরগুলো নিয়ে পথ থেকে সরতে বললে চন্ডাল উত্তর দেন তুমি কাকে সরে যেতে বলছ? আত্মা কিংবা দেহকে? আত্মা তো সর্বব্যাপী। যদি দেহকে সরে যেতে বলে থাকো, দেহ তো জড় কি করে সরে যাবে? শংকর বুঝতে পারলেন এই চন্ডাল আসলে স্বয়ং শিব এবং তার চারটি কুকুর আসলে চার বেদ। শংকর্ তাঁকে প্রণাম করে পাঁচটি শ্লোকে বন্দনা করেন। এই পাঁচটি শ্লোক মনীষা পঞ্চকম নামে পরিচিত।

হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হল হরিদ্বার। হিমালয়ের সব স্থানই তপঃপূত। তাই হিমালয়কে দেবতাত্মা বলা হয়। শংকরের অলৌকিক শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র হিমালয়ে জুড়ে। তিনি তো শুধু অদ্বৈত মত প্রচার করতে জগতে আসেননি, তাঁর আগমন বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সমগ্র অখণ্ড ভারত ভূমি পদব্রজে পরিভ্রমণ করে তিনি ধর্মের সংস্থাপন করেছিলেন। হরিদ্বার,

ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, নন্দপ্রয়াগ, জ্যোতির্ধাম, পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করে তিনি ব্যাসাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করলেন।

আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে সনন্দন ছিলেন সর্ব বিষয়ে তার যোগ্য শিষ্য। গুরু ভক্তির জন্য তিনি ছিলেন শংকরের বিশেষ প্রিয় পাত্র। এইজন্য অন্যান্য শিষ্যগণ সনন্দনকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন। শংকর এ কথা বুঝতে পেরে একদিন সনন্দনের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসমক্ষে প্রকটিত করার জন্য উচ্চস্বরে সনন্দনকে ডাকলেন। সনন্দন তখন বিশেষ প্রয়োজনে অলকানন্দা নদীর অপর পারে ছিলেন। গুরুদেবের আহ্বানে বিচলিত হয়ে তিনি ভাবলেন গুরুদেবের কিছু বিপদ হয়েছে। তাই তড়িঘড়ি সেতু অতিক্রম না করে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, অলকানন্দা নদীতে নেমে পড়লেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার ইচ্ছায় সনন্দনের প্রতি পদক্ষেপে একটি করে কমল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। ওই কমলের উপর পা রেখে নদী অতিক্রম করে তিনি আচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে সকলে বিস্মিত হলেন। আচার্য অন্যান্য শিষ্যদের বললেন আজ থেকে সনন্দনের নাম হলো পদ্মপাদ, তোমরাও ওই নামে সকলে তাঁকে ডেকো।

উত্তরকাশিতে একদিন শংকর তাঁর শিষ্যদের শারীরিক সূত্র ভাষ্য পড়াচ্ছেন। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে নানান প্রশ্নের মাধ্যমে শংকরের কাছে উত্তর জানতে চাইলেন। পর পর তিনদিন এমন চলতে থাকায় শিষ্য পদ্মপাদ ও শংকর উভয়েই অনুমান করে ব্রাহ্মণকে বললেন আমার বিশ্বাস আপনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি আমাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করুন। শংকরের উত্তরে প্রসন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বললেন তোমার অনুমান সত্য। একথা শুনেই শংকর বেদব্যাস এর পদধূলি গ্রহণ করে প্রফুল্ল চিত্তে তাঁর রচিত ভাষ্যখানি বেদব্যাস এর হাতে অর্পণ করলেন। ব্যাসদেব তা পাঠ করে বললেন ‘অতি সুন্দর হয়েছে, এ তোমারই যোগ্য’। আচার্য শংকর ব্যাসদেবের সন্নিকটেই দেহ ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শংকরের এই বাক্য শুনে ব্যাসদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে শংকরকে বললেন, ‘ না শংকর তোমার কার্য এখনও শেষ হয়নি। তোমার আয়ু মহাদেবের প্রসন্নতায় আরও ষোলো বৎসর বৃদ্ধি করা হলো। তুমি বত্রিশ বছর এ দেহে বাস করবে। তোমার প্রথম কাজ হল কুমারিল ভট্টকে বিচারে পরাজিত করা’।

গুরু ব্যাসদেবের আদেশ পালনের জন্য শংকর কুমারিলের সন্ধানে নিযুক্ত হলেন। জানতে পারলেন তিনি প্রয়াগে আছেন। প্রয়াগে এসে শংকর কুমারিলের মুখোমুখি হলেন। কুমারিল ভট্ট নত মস্তকে অভিবাদন জানালেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আচার্য শংকর ব্যাসদেবের আদেশ অনুসারে তাঁর ভাষ্যের বার্তিক রচনা করার কথা জানালেন। কুমারিল ভট্ট বললেন বৌদ্ধদের পরাস্ত করে আমি বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। তবুও আমি জীবনে দুটি মহৎ অপরাধ করেছি। একটি হল বৌদ্ধ গুরুকে বিচারে পরাস্ত করে তাঁর জীবন নাশ, দ্বিতীয়টি জৈমিনীর মীমাংসা দর্শনে একনিষ্ঠ চিত্তে ঈশ্বর অসিদ্ধ এরূপ প্রমাণ। তাই গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ করে চিত্ত সমাহিত করব পরব্রহ্মে। আপনি আমার দ্বারা যে কাজ করাতে চাইছেন তা আমার শিষ্য মন্ডন মিশ্র দ্বারা করাতে পারেন। বিচারে সে আমার থেকে কোন অংশে কম নয়, তার পরাজয় হলেই আমার পরাজয় হবে। তাকে জয় করতে পারলেই আপনার সমস্ত জগত জয় করা হবে। বিচারে আপনি মন্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতীকে মধ্যস্থতা করবেন, তিনি হলেন দুর্বাশা শাপগ্রস্থা দেবী সরস্বতী।

আচার্য শংকর তাঁর শিষ্যসহ ভারাক্রান্ত মনে মন্ডন মিশ্রের খোঁজে বেড়িয়ে অবশেষে মন্ডনের খোঁজ পেলেন। মন্ডনের সঙ্গে দেখা করে আচার্য মন্ডনকে কুমারিল ভট্টের দেহত্যাগের সংবাদ শোনালেন। আচার্য মন্ডনকে বললেন আপনার গুরু কুমারিল ভট্ট বলেছেন বিচারে আপনাকে পরাজিত করতে পারলে আপনি আমার ভাষ্যের বার্তিক রচনা করবেন। মন্ডন মিশ্র ছিলেন

মন্ত্র সিদ্ধ। তিনি মন্ত্র বলে সূক্ষ্মদেহীদের আহ্বান করতে পারতেন। শংকর ও মন্ডনের ওই বিচার খুবই বিশদভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল। টানা সতেরো দিন বিচার চলার পর আঠারো দিনে মন্ডন তার পরাজয় মেনে নিয়ে আচার্যের নিকট যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মন্ডন মিশ্র হলেন আচার্যের অন্যতম শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য।

শ্রীবেলিতে প্রায় দুশো ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। প্রভাকর নামক স্বধর্মনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করতেন ওই গ্রামে। তার একটি মাত্র পুত্র। বয়স তেরো বছর। পুত্রটি সম্পূর্ণ মুক প্রকৃতির। আচার্যের নিকট কাঁদতে কাঁদতে প্রভাকর পুত্রের জড়ত্বের কারণ কি জানতে চাইলেন। আচার্য বালক কে দেখে বিশেষ আনন্দের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন, হে শিশু তুমি কে? কার পুত্র? কোথায় যাচ্ছ? তোমার নাম কি? কোথা থেকে এসেছো? শংকরের প্রশ্ন শুনে সুমিষ্ঠ কণ্ঠে সেই বালক সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্লোক সমন্বিত করে। সকলেই স্তম্ভিত হল। আচার্য শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেন এ বালক নিশ্চয়ই কোন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। হস্তস্থিত আমলকের মতই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে এ বালক। এই স্তোত্রটি হস্তামলক নামে প্রসিদ্ধ লাভ করবে। বালককে আশীর্বাদ করে শংকর প্রভাকরকে বললেন পূর্বজন্মের শুভ কর্ম ও তপস্যার ফলে এ বালক ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একে আপনি আমার কাছে রেখে যান। একথা শুনে ব্রাহ্মণ দম্পতি বিস্মিত হলে আচার্য তাদের পূর্ব স্মৃতি জাগ্রত করার জন্য বললেন, মনে করে দেখুন পুত্রের যখন দুই বৎসর বয়স তখন যমুনাতে স্নানের সময় আপনার পুত্র খেলা করতে করতে নদীর জলে পড়ে মৃত্য মুখে পতিত হলে আপনারা মৃত পুত্রকে নিয়ে যমুনা পুলিনে ধ্যানরত এক যোগীর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই যোগী মৃত বালকের দেহে প্রবেশ করার ফলে বালক জীবিত হয়ে উঠলে, আপনারা আনন্দে পুত্রকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ বাস করছেন এই বালকের দেহে। সেই জন্য এ বালক পূর্ণ জ্ঞানী। আচার্যের কথা শ্রবণ করে ব্রাহ্মণ দম্পতির সে ঘটনার স্মরণ হল। বালক তখন তার মাকে বলল মা আমার পরিচয় তো পেলেন, আমাকে আচার্যের কাছে থাকার অনুমতি দিন। ব্রাহ্মণ দম্পতি উদাস প্রাণে গৃহে ফিরে গেলেন। আচার্য বালককে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। তার নাম হলো হস্তমলাকাচার্য।

শৃঙ্গেরিতে অবস্থানকালে গিরি নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। গিরি লেখাপড়া বিশেষ জানতো না, কিন্তু একনিষ্ঠভাবে গুরু সেবায় ব্রতী ছিল। শাস্ত্র বলে একমাত্র গুরু সেবাতেই শিষ্যের চতুর্বর্গ লাভ হয়। গিরির নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়, গুরুদেব শিষ্যদের যখন শাস্ত্রাদি পড়াতেন গিরি তখন বেশ অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতো। অল্পদিনের মধ্যেই গিরি আচার্যের পরমপ্রিয় পাত্র হলেন। আচার্যের শিষ্যগণ বহু পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, সেদিক থেকে গিরি অন্যান্য শিষ্যদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। কথিত আছে, একদিন গিরি গুরুদেবের বস্ত্র ধোওয়ার জন্য নদীতে গেছেন, আচার্যের অধ্যাপনার সময় উপস্থিত হওয়ায় সকল শিষ্য সমবেত হয়েছেন। আচার্য শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘একটু অপেক্ষা করো গিরি এখনই আসবে’। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর গিরি না আসায় পদ্মপাদ বললেন, ‘গিরি কি আপনার শাস্ত্র ব্যাখ্যা বুঝতে পারে?’ আচার্য বললেন গিরি বুঝতে পারে না সত্য কিন্তু সে অতি শ্রদ্ধা সহকারে শোনে সবকিছু। এদিকে গিরি অনুভব করতে লাগল গুরুদেব যেন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকে আশীর্বাদ করছেন, তার অন্তর এক দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমগ্র মন প্রাণ ভরে গেল এক অনির্বচনীয় আনন্দে। গিরি নদী থেকে আসার সময় তার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছিল ছন্দবদ্ধ শ্লোক। অন্যান্য শিষ্যগণ বুঝতে পারলেন যে গুরু কৃপা বলে গিরি এই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছে। এক শুভ দিনে আচার্য গিরিকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন, তার নাম হলো তোটকাচার্য।

বেদান্ত সব ধর্মের বিজ্ঞানস্বরূপ। মানবজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার জন্য বেদান্তচর্চার বিশেষ প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে ‘ভবিষ্যতে সারা জগতের চিন্তাশীল মানুষের ধর্মই হবে বেদান্ত’। এমন একটা দিন আসবে যখন

একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ধর্ম হবে পৃথক পৃথক। আসলে ধর্ম বলতে মত বা পদ্ধতি বোঝায় না, ধর্ম বলতে বোঝায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি। মানুষ যত শীঘ্র এ কথা বুঝবে, তত শীঘ্র ঘটবে এটি। বেদান্ত কোন দেশ, জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় বিশেষের মানুষের জন্য নয়, জড় প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্য গুলির মতো এগুলিও সর্বদেশের, সর্বযুগের, সর্বধর্মের, সর্বভাবের মানুষের জন্য উদঘাটিত আন্তঃপ্রকৃতির সত্য। বেদান্তের চরম সত্য উপলব্ধির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপায়িত করে ত্যাগের অধিকারী হওয়াই হল গীতার শিক্ষা। সংসারে থেকেও আমরা জ্ঞানের চর্চা করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'নৌকা জলে থাকতে পারে কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে'; তেমনই মানুষ সংসারে থাকতে পারে কিন্তু সংসার যেন তার ভিতরে প্রবেশ না করে।

শংকরাচার্যের আবির্ভাবের সময়ে ভারতীয় সমাজ কুসংস্কার, ধর্মের গোড়ামীতে আচ্ছন্ন ছিল। বৈদিক ধর্ম তথা হিন্দু ধর্ম তখন অবক্ষয়ের পথে। হিন্দু ধর্মকে বাঁচাতে তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে বেদের অর্থকে নিজের ভাষায় প্রচার করতে শুরু করলেন। সকলকে পুনরায় বেদ শিক্ষা দিলেন। এরপর অদ্বৈতবাদ প্রচার শুরু করলেন। অদ্বৈত বাদের মূল কথাই হল- 'ব্রহ্ম সত্য, জগত-মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন' অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জীবকে ব্রহ্ম মনে করে প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীবের প্রতি ভালোবাসা জাগালেন তিনি, এর ফলেই বন্ধ হল ধর্মীয় ভেদাভেদ, হানাহানি।

শংকরাচার্য তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে গ্রন্থে স্থান দেন। শংকরাচার্যের রচিত গ্রন্থ গুলি হল বিবেক চুড়ামনি, পঞ্চীকরণ, বাক্যসুধা, দশশ্লোকী, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি। হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের চারকোণে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রধান চার শিষ্যকে চারটি মঠের আচার্য হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পূর্বদিকে উড়িষ্যার পুরীধামে স্থাপিত হল গোবর্ধন মঠ, এখানে প্রথম আচার্য নিযুক্ত হলেন পদ্মপাদ। পশ্চিমদিকে গুজরাটের দ্বারকাধামে স্থাপিত হল সারদা-মঠ, এখানে প্রথম আচার্য নিযুক্ত হলেন হস্তামলক (পৃথ্বীধর)। উত্তরদিকে বদ্রিকাশ্রমের জ্যোতির্ধামে স্থাপিত হল জ্যোতির্মঠ, এখানে প্রথম আচার্য নিযুক্ত হলেন তোটক। দক্ষিণদিকে কর্ণাটকের রামেশ্বরধামে স্থাপিত হল শৃঙ্গেরি মঠ, এখানে প্রথম আচার্য নিযুক্ত হলেন সুরেশ্বর (বিশ্বরূপ)। শংকরাচার্য বৈদিক ধর্মকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দশনামি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দশনামি সম্প্রদায় হলো গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য। সন্ন্যাসীদের এই দশ সম্প্রদায় চার মঠের অধীনে থেকে (যেমন জ্যোতির্মঠের অধীনে গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায়, শৃঙ্গেরি মঠের অধীনে সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায়, সারদা মঠের অধীনে তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায় এবং গোবর্ধন মঠের অধীনে বন ও অরণ্য সম্প্রদায়) মঠের নিয়ম ও নির্দেশ অনুসারে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন।

বদ্রিধামে কিছুদিন থাকার পর সশিষ্য আচার্য যাত্রা করলেন উত্তরাখণ্ডের কেদার ধামের বদ্রিকাশ্রমে। আচার্য স্নিগ্ধ কণ্ঠে শিষ্যদের জানালেন যে, দেহের কার্য তার সমাপ্ত হয়েছে এখন তার স্বরূপে লীন হবার সময় তাই যদি কারোর কিছু জানার থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করো। সজল নয়নে তাঁর প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদ বললেন, 'হে দেব আপনার কৃপায় আমরা পূর্ণ মনোরথ হয়েছি, আমাদের জানার আর কিছুই নেই, শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালনই জীবনের একমাত্র কর্তব্য মনে করি'। অবশেষে বত্রিশ বছর বয়সে শংকরাচার্য কেদারনাথের বদ্রিকাশ্রমে দেহত্যাগ করলেন। কেদারনাথেই শংকরাচার্যের সমাধিটি রয়েছে।

আচার্য যে মহানুশাসন রেখে গিয়েছিলেন তাতে বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের সংঘ জীবনের নির্দেশ বর্তমান। আচার্য শংকরের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই এখন অতীতের ঘটনা, কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী সনাতন হিন্দু ধর্মের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বৈদিক ধর্মের মর্মবাণীর উপর করেছে স্নিগ্ধ আলোকসম্পাত। দ্বাদশ শতাব্দী পরেও শংকরাচার্য পুরাতন হয়ে যাননি। সকল

মানুষের ভিতর এক অবিভাজ্য চৈতন্য সত্তা জ্বলজ্বল করছে। প্রত্যেক মানব সংসারের বৃহত্তম সত্য ব্রহ্ম। শংকরাচার্যের বত্রিশ বছরের অলৌকিক জীবন এই বিপুল সত্যের মূর্ত প্রকাশ।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী অপূর্বানন্দ; আচার্য শংকর; উদ্বোধন কার্যালয়; কলকাতা, ২০২২

২। শ্রী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ; আচার্য শংকর ও রামানুজ

৩। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ; গল্পে বেদান্ত; রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম; কলকাতা

৪। Kumar. N. ; Life of Shankaracharya - The Adventures of a Poet Philosopher; 2005